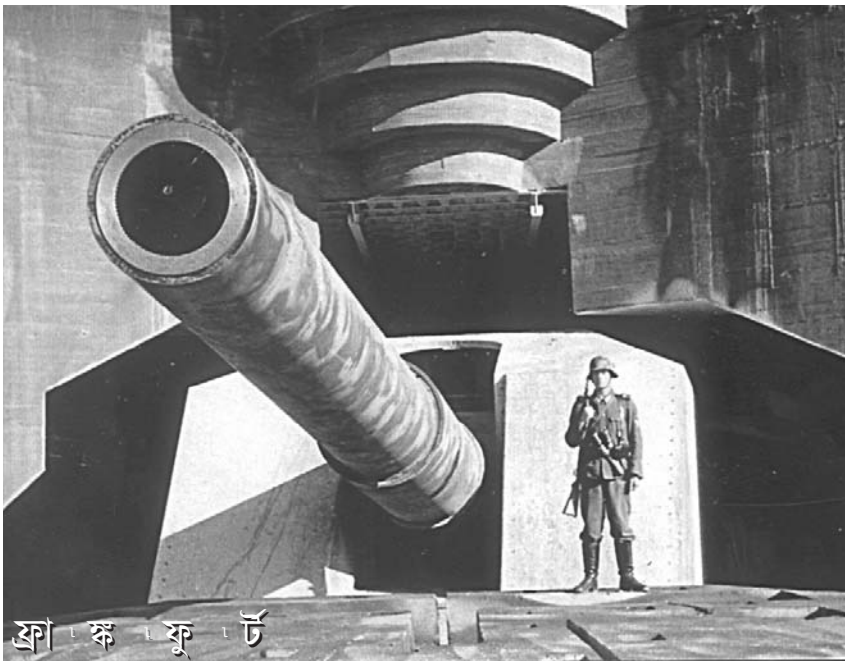

ডি-ডে, ইউরোপের স্বাধীনতা দিবস

'ফরাসি বিমানবাহী জাহাজ চার্লস দ্য গল ফ্রান্সের নরমান্ডি উপকূলের আকাশসীমা প্রহরা দিচ্ছে'। 'সমগ্র ফ্রান্সে স্মরণকালের সবচেয়ে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে'। 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ'। এই ছিল গত সপ্তাহে জার্মান খবরের কাগজগুলোর প্রধান শিরোনাম। ৬ জুন '০৪ ফ্রান্স উদ্‌যাপন করেছে ইউরোপের ৬০তম মুক্তি দিবস, যার অন্য নাম ঐতিহাসিক 'ডি-ডে'। ডে অব ডিসিশন। সহজ বাংলায় 'মরণ ছোবল'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪৪ সালের এই দিনটিতে ফ্রান্সের নরমান্ডিতে জার্মান এবং মিত্রবাহিনীর এক সম্মুখযুদ্ধে উভয় পক্ষে বয়ে যায় রক্তবন্যা। অনেক সমর বিশেষজ্ঞের ধারণা মূলত নরমান্ডির এই যুদ্ধেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল মিত্র বাহিনীর পক্ষে ঘুরিয়ে দেয়। দিনটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে সারা বিশ্বের ১৭টি দেশের ১৭ জন রাষ্ট্রপ্রধান ফ্রান্সের সমুদ্র তীরবর্তী সৈকত-শহর নরমান্ডিতে একত্রিত হয়েছেন। ডি- ডের ৬০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ফ্রান্স এবার আয়োজন করেছে এক ব্যয়বহুল রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠান। যে দিনটি জার্মানিসহ ১৭টি দেশ ফ্রান্সে উদ্‌যাপন করলো সে দিনটিতে নামে অনেক চলচ্চিত্রও তৈরি হয়েছে। হলিউডের এমনই একটি ছবির নাম ছিল দ্য লংগেস্ট ডে।

৬ জুন ১৯৪৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকের এই সময়টিতে প্রতিবেশী অনেক দেশের মতো ফ্রান্সও চার বছর যাবৎ জার্মানির পদানত। বছরের শুরু থেকেই ফ্রান্সকে মুক্ত করার জন্য মার্কিন ও ব্রিটিশ যৌথ বাহিনী ইংল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চল থেকে ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলীয় শহর জাইনে এবং লইরের সংযোগকারী রেল লাইন ও ব্রিজগুলোর ওপর অবিরাম বোমাবর্ষণ করে আসছে। এ সময় তারা জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সের মাটিতে ২ লাখ টনেরও বেশি বোমা নিক্ষেপ করে। ইঙ্গ-মার্কিন এই অপেক্ষাকৃত দুর্বল অভিযানটির নাম ছিল নেপচুন, যা মূলত ৬ জুন শুরু হওয়া মূল হামলা 'অপারেশন ওভারলর্ড'-এর প্রস্তুতিপর্ব। অক্ষশক্তি হিটলারের হাত থেকে ফ্রান্স তথা ইউরোপের অবশিষ্ট দেশগুলো মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মরণ ছোবল অপারেশন ওভারলর্ডের প্রস্তুতি হিসেবে ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ বাহিনী ইংল্যান্ডের মাটিতে সমাবেশ ঘটায় ১৭টি দেশের বিশাল এক সৈন্যবহর। ১৭ লাখ ব্রিটিশ এবং ১৫ লাখ মার্কিন সৈন্য অবস্থান নেয় ইংল্যান্ডের ডেভন লন্ডনের মাঝামাঝি এলাকায়। তাদের সঙ্গে অন্যান্য অনেক দেশের মধ্যে আরো যোগ দেয় কানাডা, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, চেক, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, নরওয়ে এবং খোদ জার্মানির নির্বাসিত সর্বমোট ১ লাখ ৭৫ হাজার সৈন্যের এক সুবিশাল সৈন্য বাহিনী।

অন্যদিকে দখলদার জার্মান বাহিনীও আঁচ করতে পারে মিত্র বাহিনীর পরিকল্পনা। অর্থাৎ জার্মান বাহিনীর হাত থেকে ফ্রান্স তথা ইউরোপকে মুক্ত করতে হলে মিত্র বাহিনীর পক্ষে একমাত্র যা করণীয়, তা হলো সর্বপ্রথম ফ্রান্সের মাটিতে অবতরণ করা। কিন্তু কোথায় অবতরণ করবে মিত্র বাহিনী। দখলদার জার্মান বাহিনী ফ্রান্সের উপকূল এলাকায় যেভাবে নিশ্ছিদ্র দুর্গ তৈরি করে রেখেছে তাতে মিত্র বাহিনীর পক্ষে একমাত্র সম্মুখযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী ঝুঁকি ছাড়া অন্য কোনো পথ অবশিষ্ট ছিল না। জার্মান বাহিনীও এটা জানতো। কিন্তু মিত্র বাহিনী ফ্রান্সের ঠিক কোথায় অবতরণ করতে পারে তা নিয়ে জার্মান ফিল্ড মার্শালরা এবং স্বয়ং হিটলারও সন্দিহান ছিলেন। মিত্র বাহিনীর সম্ভাব্য হামলা এবং অবতরণ প্রতিরোধ করতে কয়েক লাখ জার্মান সৈন্য এবং বিনা পারিশ্রমিকে বাধ্য শ্রমিকরা মিলে চার বছর ধরে নরওয়ে এবং স্প্যানিশ সীমান্ত ঘেঁষে ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতে তৈরি করে ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য এবং নিশ্ছিদ্র এক দুর্গ যার নাম 'আটলান্টিক ওয়াল'। এই ভয়ঙ্কর দুর্গের অভ্যন্তরে ১২ হাজার বাঙ্কার তৈরি করতে জার্মান বাহিনী ব্যবহার করে ১৭.৩ মিলিয়ন টন কংক্রিট এবং ১.২ মিলিয়ন টন ইস্পাত। শুধু তাই নয়, দুর্গের প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করার জন্য জার্মান বাহিনী ফ্রান্সের উপকূলে স্থাপন করে ৬.৫ মিলিয়ন মাইন এবং পানির নিচে লুকানো জাহাজ বিধ্বংসী ৫ লাখ বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক। আর আটলান্টিক ওয়ালের পেছনে ফ্রান্সের মূল ভূখন্ডে অবস্থান নেয় জার্মান সামরিক বাহিনীর দুর্ধর্ষ সেনানায়ক ফিল্ড মার্শাল রোমেলের অধীনে সপ্তম স্থলবাহিনী যার অধীনে ছিল ২৪৩ পদাতিক ডিভিশনের ১২ হাজার সৈন্য, ৭০৯ পদাতিক ডিভিশনের ১২ হাজার ৬৫৩ জন সৈন্য, ৯১ বিমানঘাঁটির ১০ হাজার ৫৫৫ সৈন্য, ছত্রীসেনার ৬নং রেজিমেন্ট, ৩৫২ পদাতিক ডিভিশনের ১২ হাজার সৈন্য, ৭১৬ পদাতিক ডিভিশনের ৮ হাজার সৈন্য, ২১ গোলন্দাজ ডিভিশনের ১৬ হাজার সৈন্য হিটলারের নিজস্ব ১২ গোলন্দাজ ডিভিশনের ২০ হাজার ১৫০ সৈন্য এবং ৭১১ পদাতিক ডিভিশনের ১৩ হাজার সৈন্য।

৬ জুন ১৯৪৪ রাত ১টা ৩০ মিনিটে অপারেশন ওভারলর্ড শুরু হলে ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ বাহিনীর বিমানবহর থেকে সর্বমোট ২৩৪৯০ জন ছত্রীসেনার প্রথম দলটি অধিকৃত এলাকায় প্যারাসুট নিয়ে অবতরণ করে। সেদিনই বিশ্বের মানুষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জল, স্থল ও আকাশ যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ এক মাত্রা অবলোকন করে। নরমান্ডির সমুদ্র উপকূলে মিত্র বাহিনীর উপস্থিতি জার্মান প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ছিল খুবই আচমকা। কারণ যে দিন মিত্র বাহিনী নরমান্ডিতে অবতরণ করে, তার আগের

সন্ধ্যায়ও জার্মান সামরিক বাহিনীর পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রধান ফিল্ড মার্শাল রুন্ডস্টেড্ট মিত্র বাহিনীর যেকোনো ধরনের হামলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেন। নরমান্ডিতে মিত্র বাহিনী অবতরণ করতে পারে এটা স্বয়ং হিটলারের ধারণাতে ছিল না। হিটলার এবং তার ফিল্ড মার্শালরা কোলাইস নামের অন্য একটি সৈকতে মিত্র বাহিনীর অবতরণের আশঙ্কা করছিলেন। তাই শক্তিশালী ৯ম স্থলবাহিনীকে কোলাইসে অকারণে দীর্ঘদিন মোতায়েন করে রাখা হয়। অপরদিকে দুরদর্শী ফিল্ডমার্শাল রোমের বিপদের সম্ভাবনা ঠিকই আঁচ করতে পেরেছিলেন। মিত্র বাহিনীর অবতরণের আগে ফিল্ড মার্শাল রুন্ডস্টেড্ট এবং ফিল্ড মার্শাল রোমেল জার্মান প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ঘোরতর বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। অবশেষে যখন তারা একমত হয়ে হিটলারের কাছে ২১তম গোলন্দাজ ডিভিশনের সাহায্য চেয়ে খবর পাঠালেন তখন হিটলার ঘুমাচ্ছিলেন। ৬ জুন হিটলার অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমালেন। কেউ তাকে জাগাতে সাহস করলো না। নরমান্ডির সৈকতে নারকীয় যজ্ঞতা শেষে মিত্র বাহিনী যখন ফ্রান্সের মূল ভূখন্ডে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, অত্যাধুনিক ট্যাঙ্ক সজ্জিত জার্মান গোলন্দাজ বাহিনীর ৬টি শক্তিশালী ডিভিশন প্যারিসের অদূরে তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল, যেগুলো শুধু হিটলারের স্পষ্ট নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল এবং যেগুলো চলতে শুরু করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল অন্যরকমও হতে পারতো বলে সমর বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

মার্কিন এবং ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর ভারী ও মাঝারি মানের বোমারু বিমানগুলো শুধু ৬ জুন নরমান্ডির উপকূলে ১৪ হাজার বার বিমান হামলা করে সৈকতটিকে এক নরকপুরীতে পরিণত করে। তারপর ভোর ৬টা ৩০ মিনিটে ৭টি মিসাইলবাহী জাহাজ, ২৩টি ক্রুজার জাহাজ এবং ১০৫টি ডেস্ট্রয়ার নরমান্ডির সমুদ্র উপকূলে এসে পৌছালে ছোট ছোট জাহাজে করে সৈন্যরা সৈকতে অবতরণ করতে শুরু করে এবং জার্মান প্রতিরক্ষাব্যুহের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। রাত ১২টা পর্যন্ত ১ লাখ ৫৫ হাজার সৈন্য ১৬ হাজার সাঁজোয়া যানে করে পূর্ব পরিকল্পনা মতো ৫টি সৈকতের চারটি ইউটাহ, গোল্ড, জুনো এবং সোর্ড তেমন কোনো বাধা ছাড়াই দখল করে নেয়। শুধু ওমাহা সৈকতে মার্কিন বাহিনী জার্মান বাহিনীর ব্যাপক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। মার্কিন বাহিনীর ১ম এবং ২৯তম পদাতিক ডিভিশনের পুরো এক দিন লেগে যায় সৈকতটি দখল করতে। মিত্র বাহিনীর হাতে ছিল তখন ৮৬ ডিভিশন সৈন্য, ১২১৩টি যুদ্ধজাহাজ, ৪১২৬টি পরিবহন বিমান, ৫১১২টি বোমারু বিমান, ৫৪০৯টি জঙ্গি বিমান এবং ২৩১৬টি অন্যান্য বিমান। শুধু ডি- ডে, তে মিত্র বাহিনীর হাতে সর্বমোট ১৪ হাজার ৬শ' ৪৭টি বিমান ছিল। ৩০ জুন ১৯৪৪ যখন অফিসিয়ালি নেপচুনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়, তখন নরমান্ডিতে ৮ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি সৈন্য ছিল। জুলাইয়ের শেষ দিকে এই সংখ্যা ১৬ লাখ ছাড়িয়ে যায়। যুদ্ধে মিত্র বাহিনীর ৫৭ হাজার সৈন্য নিহত হয় এবং ১৫০ হাজার আহত হয়। অপরপক্ষে জার্মান বাহিনীর নিহত হয় ৬০ হাজার, আহত হয় ১ লাখ ৪০ হাজার এবং বন্দী হয় ২ লাখ ১০ হাজার সৈন্য। এছাড়া ২০ হাজার বেসামরিক লোক নিহত হয়। নরমান্ডি দখলের পর মিত্র বাহিনী ২ আগস্ট রাজধানী প্যারিসের পথে যাত্রা করে এবং ২৫ আগস্টের মধ্যে প্যারিস এবং ফ্রান্সের প্রায় সমগ্র অঞ্চল মুক্ত করতে সক্ষম হয়। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ সালে মিত্র বাহিনী সর্বপ্রথম সীমান্ত শহর ট্রিয়ার হয়ে জার্মান মূল ভূখন্ডে ঢুকে পড়ে। এর পরের ইতিহাস সবার জানা।

৬ জুন ২০০৪ ফ্রান্স আয়োজন করেছে ইউরোপ বিমুক্তকরণের ৬০তম পূর্তি উৎসব। উৎসবে আমন্ত্রিত ১৭টি দেশের রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ, প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ। সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কায় ফ্রান্স এ উপলক্ষে স্মরণকালের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উপকূলে ১৭টি যুদ্ধ জাহাজ সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত ছিল। আকাশসীমা প্রহরার সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল বিমান বাহিনীর এক বিশাল জঙ্গি বিমানবহর। রাষ্ট্রীয় অতিথিদের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে ১৮ হাজার নিরাপত্তাকর্মী, ৬ হাজার বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ, ৩৩০০ সাধারণ পুলিশ, ৮ হাজার সেনা সদস্য এবং ১৫০০ দমকল কর্মী। পূর্তি উৎসবে সবচেয়ে সম্মানিত অতিথি হিসেবে যারা অংশ নিয়েছেন তারা হচ্ছেন নরমান্ডির যুদ্ধে প্রাণে বেঁচে যাওয়া বেশ কিছু প্রাক্তন সৈনিক যাদের প্রায় প্রত্যেকেরই বর্তমান বয়স আশির ওপর। অশীতিপর এ সৈনিকদের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে ফরাসি সরকার নিয়োজিত করেছে ১৫০০ নার্স এবং সেবা কর্মী। সব মিলিয়ে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রতিদিন ব্যয় হয়েছে ৮ লাখ ইউরো, যার পুরোটা যোগান দিয়েছে ফরাসি করদাতারা অর্থাৎ সাধারণ জনগণ।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সম্ভবত এতেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি তার নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন ৫০০ নিরাপত্তা কর্মী। ৬০ বছর পর সত্যিকার অর্থে এবারই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করে প্রথমবারের মতো ডি-ডেতে আমন্ত্রিত হয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডার। নরমান্ডিতে জার্মান সেনাদের ৬টি সমাধিক্ষেত্র, যেখানে সর্বমোট ৫০ লাখেরও বেশি নিহত জার্মান সৈনিকের সমাধি রচিত হয়েছে, সেখানে জার্মান চেন্সেলর শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যাবেন না বলে আগেই এক বিতর্কিত ঘোষণা দিয়েছেন। জার্মান চ্যান্সেলর শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন শুধু রনভিলের একটি ব্রিটিশ সমাধিক্ষেত্রে, যেখানে মাত্র ২০০ ভাগ্যাহত জার্মান সৈনিকের সমাধি রয়েছে। অনুষ্ঠানে জার্মান চ্যান্সেলরের আমন্ত্রণপ্রাপ্তি ফ্রান্সে কোনো বিতর্কের জন্ম দেয়নি। ফ্রান্সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্তন সৈনিকদের বিভিন্ন সংগঠন জার্মান চ্যান্সেলরের আমন্ত্রণপ্রাপ্তিকে বরং স্বাগতই জানিয়েছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রাক্তন সৈনিকদের অনেকগুলো সংগঠন জার্মান সমাধিক্ষেত্রে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ফ্রান্সের ২০০৭ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অন্যতম পদপ্রার্থী প্রাক্তন মন্ত্রী লরেন ফাবিয়াস বলেন, ফরাসি স্বাধীনতা এবং ইউরোপের মুক্তির জন্য যে মানুষগুলো নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে, তাদের স্মরণে আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন অনুষ্ঠানে এক যুদ্ধবাজ, অন্যের স্বাধীনতা হরণকারী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের উপস্থিতি কখনোই কাম্য হতে পারে না। সভ্য জগতে কূটনীতির এই কঠিন ভাষার মূলত যা অর্থ দাঁড়ায় তা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা হলে 'ছাপার অযোগ্য' বলে বিবেচিত হবে।

মোঃ ইসমাইল হোসেন বাবু
Friedberger Anlage 3
60314 Frankfurt, Germany

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ
প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

জা ৷ পা ৷ ন

আত্মহত্যার হিড়িক

জাপান শুধু প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেই পৃথিবীর প্রথম সারির একটি দেশ নয়। আত্মহত্যার দিক থেকেও অন্যতম। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা সত্ত্বেও জাপানিজরা কেন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় তা অনেককেই ভাবিয়ে তোলে। জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা NHK (Nippon/Nihon Housou Kyokai)-এর তথ্য অনুযায়ী গত এক বছরে জপানে ৩১,৩০৫ জন জাপানিজ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। যার অধিকাংশই মধ্যবয়স্ক বা বয়স্ক লোকজন। এই সংখ্যা নেহাত কম নয়, রীতিমতো আঁতকে ওঠার মতো একটি সংখ্যা। তার আগের ১০ বছরের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, আগের তুলনায় আত্মহত্যার প্রবণতা ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। আত্মহত্যা বৃদ্ধি প্রবণতার কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞগণ প্রধানত দুটি খাতকে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম অর্থনৈতিক মন্দা থেকে অনিশ্চয়তা এবং দ্বিতীয় অতিরিক্ত পরিশ্রম থেকে বিষণ্ণতা। ইঙ্গ-মার্কিন-ইরাক যুদ্ধের খরচ হিসেবে মোটা অঙ্কের অর্থ জাপানকে যোগান দিতে হয়। যুদ্ধের চাপ এসে পড়ে জাপানি অর্থনীতিতে এবং যার প্রভাব পড়ে সাধারণ জনগণের ওপর। বিভিন্ন কোম্পানিকে শ্রমিক ছাঁটাই করতে হয়। ছাঁটাইকৃত শ্রমিককে ঋণ করে ভরণপোষণ করতে হয়। এভাবে ঋণের পরিমাণ যখন ভারী হয়ে যায় তখন ঋণ দেয়া কোম্পানিগুলো তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ঋণের টাকা শোধ করতে না পারার গ্লানিতে অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

অতিরিক্ত পরিশ্রমকেও আত্মহত্যার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জাপানিজরাই বোধ হয় একমাত্র জাতি যারা কর্মক্ষেত্রে বসের হুকুমের ওপর কোনো রকম প্রতিবাদ না করে হুকুম পালনে ব্রত হয়। তার ওপর রয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়েও অতিরিক্ত সময় কাজ। অতিরিক্ত সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক দেয়ার বিধান এবং চুক্তি থাকলেও খুব কম ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পরিশোধ করা হয়। বিশেষ করে উঁচু পদে আসীন কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে। উঁচু পদে আসীন কর্মকর্তারা বিনা পারিশ্রমকে অতিরিক্ত সময় কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তারা একদিকে যেমন তার অধীনস্থ কর্মচারীদের ওপর প্রভাব খাটায়। তেমনি অপরদিকে পরিবারকে সময় দিতে না পারা, বিনোদন করার সময় এবং সুযোগ না পাওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। বিষণ্ণতা থেকে একদিন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এ ছাড়া একাকিত্ব জীবনকেও আত্মহত্যার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে। জাপানে একাকিত্ব জীবন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রতি ৫ জনের মধ্যে একজন ৬৫ বা তার উর্ধ্বে। একটি মানুষ যখন একাকিত্ব জীবন যাপন করে, তখন তার জীবন যাপনে ছন্দপতন ঘটে। সব ক্ষেত্রেই একটি অনিয়ম চলে আসে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে খাদ্যাভ্যাসের ওপর। অনিয়মিত খাদ্য গ্রহণ শারীরিক এবং মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করে। আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়। ধীরে ধীরে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একদিন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এভাবে জাপানে আত্মহত্যার পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

রাহমান মনি, rahman-moni@ng.tokai.or.jp
টোকিও জাপান

ই ৷ টা ৷ লি

পরকীয়া প্রেমের বলি সামসু

ইটালির ভেনিস প্রভিন্সের ইসপেনিয়াস্থ এক পার্কে মোঃ এমদাদুল হক সামসু (৪৩) নামের এক বাংলাদেশী যুবক নিহত হয়। নিহত এমদাদুল হক সামসুকে হত্যা করে তার স্ত্রী ও স্ত্রীর প্রেমিক। ইটালির সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পুলিশ বাহিনী কারাবিনিয়েরির ব্যাপক তৎপরতা খুব অল্প দিনেই উদঘাটিত হয়ে পড়ে এ হত্যা রহস্য। বিস্মিত হয় সাধারণ মানুষ। হতবিহ্বল হয়ে পড়ে বাংলাদেশী কমিউনিটি। জুন মাসের একদিন বেলা ১২টার দিকে মোঃ এমদাদুল হক সামসুর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পার্কে ঘুরতে আসা এক ব্যক্তির মাধ্যমে খবর পেয়ে ইটালির সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর পুলিশ বাহিনী কারা বিনিয়েরি ঘটনাস্থল থেকে সামসুর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ এ হত্যাকান্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে নিহত সামসু'র স্ত্রী ইয়াসমীন আক্তারসহ পরিচিত অনেককেই দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। এমনকি সামসু যেখানে কাজ করতো, এক বছর আগে যে বাসায় থাকতো সেখানেও পুলিশ হানা দেয়। হত্যাকান্ডের একদিন পর পোস্টমর্টম রিপোর্টে বলা হয়, সামসুকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। তবে মাথা ও বুকে মৃদু আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ রিপোর্ট প্রকাশের পর পুলিশ মরিয়া হয়ে খুঁজতে থাকে হত্যা রহস্য। এ সময় ভেনিসের Radio Base থেকে প্রচারিত বাংলা খবরের একটি সূত্র ধরে পুলিশ নিহত সামসুর স্ত্রী ইয়াসমীন আক্তারকে (৩৭) ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায় গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে পাঠায়। ইয়াসমীনের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তার পরকীয়া প্রেমিক সেলিম সিকদারকে (২৮) পুলিশ গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে পাঠালে ইয়াসমীন ও সেলিম তাদের জবানবন্দিতে বলে, তাদের যৌথ পরিকল্পনায় সেলিম এ হত্যাকান্ড ঘটায়। সামসুকে হত্যার সময় ঘটনাস্থলে সামসুর স্ত্রী ইয়াসমীন আক্তার উপস্থিত ছিল এবং সামসুর শ্বাসরোধ করতে ইয়াসমীনের ওড়না ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণকারী সামসু ১৯৯০ সাল থেকে বৈধভাবে ইটালিতে বসবাস করছিলেন। তিনি একটানা ৯ বছর ভেনিসের একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে সামসু ছিলেন অত্যন্ত নম্র ও শান্ত প্রকৃতির। সামসু ও ইয়াসমীন ১০ বছরের একটি পুত্র ও ৫ বছরের এক কন্যাসন্তান নিয়ে '৯৭ সাল থেকে ম্যাস্ত্রের নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। ইয়াসমীনের পরকীয়া প্রেমিক ও শামসুর হত্যাকারী সেলিম সিকদার সম্পর্কে ইয়াসমীনের বিয়াই। সামসুর সঙ্গে ইয়াসমীনের বিয়ের আগে থেকেই প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সেলিম সিকদার বাংলাদেশে সেনাবাহিনীতে চাকরি করতো। মাত্র কয়েক মাস আগে ইয়াসমীনের প্রেমের টানে সে চোরাই পথে ইটালিতে প্রবেশ করে অবৈধভাবে অবস্থান করছিল। ইউরোপে পরকীয়া প্রেমের জন্য হত্যাকান্ড এমন একটা বিরল ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইটালির সব পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন বিষয়টি ফলাওভাবে প্রচার করছে। এদিকে সামসু হত্যার পরিকল্পনাকারী ইয়াসমীনকে ১০ ও ৫ বছরের দুটি সন্তান বাবা-মা দু'জনেরই স্নেহ থেকে বঞ্চিত থাকছে বিধায় ইয়াসমীনের মুক্তি দেয়া হতে পারে বলে একটি মানবাধিকার সংস্থার মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশী কমিউনিটির মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কমিউনিটি বলেছে, কোনোভাবেই সামসু হত্যার সঙ্গে জড়িত কারো মুক্তি হতে পারে না। তারা প্রশাসনের কাছে সুবিচার দাবি করেছে।

বাঁ দিক থেকে নিহত সামসু, স্ত্রী ইয়াসমীন ও প্রেমিক সেলিম

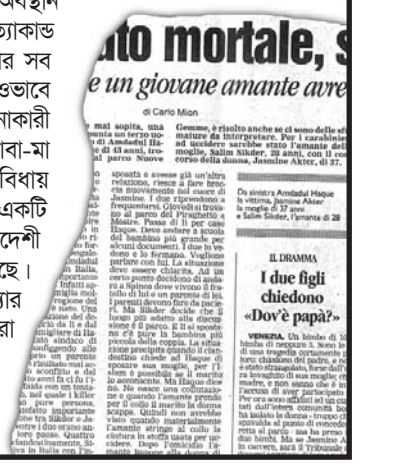

ইটালির পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয়

ato mortale, s

e un giovane amante avre

di Carlo Mion

IL DRAMMA

I due figli chiedono «Dov'è papà?»

পলাশ রহমান, ইটালি,
palashrahman@libero. it

কা । না । ডা

কানাডার সাধারণ নির্বাচন

স্বাস্থ্য খাতে অর্থ ব্যয়ের প্রতিশ্রুতি

জসিম মল্লিক, অটোয়া থেকে

কানাডায় এ মাসের শেষে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলো ভোটারদের মন জয় করার জন্য স্বাস্থ্য খাতে বিপুল অর্থ ব্যয়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। তবে বহু প্রার্থী মনে করেন, সুবিধা ভোগকারীদেরই এই ব্যয় নির্বাহ করা উচিত অথবা বেসরকারি খাতকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। আগামী ২৮ জুন কানাডায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

জনমত জরিপে দেখা গেছে, এই নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার প্রচারণায় স্বাস্থ্য মানের বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে। কানাডীয় বিভিন্ন জনমত জরিপ সংস্থার জরিপে এ চিত্র দেখা গেছে। কানাডার সরকারি অর্থে পরিচালিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যাদের প্রয়োজন তাদের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে এ ব্যবস্থায় চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় এবং এ ক্ষেত্রে বিরাট লাইন ধরতে হয় বলে এটা ততোটা জনপ্রিয় নয়। কানাডায় বেসরকারি খাতে স্বাস্থ্য সেবার কোনো ব্যবস্থা নেই। এবং সে দেশের আইনে তা নিষিদ্ধ। কানাডার কলেজ অব ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের প্রধান ডা. ক্যালভিন গাটকিন বলেন, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কানাডার জন্য পরিচায়ক হিসেবে প্রযোজ্য। এটা আমাদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে আলাদা পরিচয় দিয়েছে। কানাডার এক লাখ লোকের সংগঠন কাউন্সিল অব কানাডার প্রধান মড বার্লো বলেন, আমরা মনে করি সরকারি খাতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দেশের প্রতিটি নাগরিকের উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা লাভের অধিকার রয়েছে এবং তা অর্থের বিনিময়ে নয়। প্রয়োজন অনুসারে এই সংস্থাটি নাগরিক অধিকার সংস্থা হিসেবে কাজ করে থাকে। প্রধানমন্ত্রী পল মার্টিনের ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টি আগামী ৫ বছরে স্বাস্থ্য খাতে ১১ বিলিয়ন কানাডীয় ডলার ব্যয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মার্টিন এই পরিকল্পনা ঘোষণা করে বলেন, এটি সরকার হিসাবে আমাদের এক নম্বর অগ্রাধিকার। এই দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী জন ক্রিটিয়েন অবসর গ্রহণ করলে পল মার্টিন গত ডিসেম্বরে ক্ষমতাসীন হন। তিনি নতুন ৫ বছর মেয়াদে ক্ষমতাসীন হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। তবে সাবেক সরকারের স্বাস্থ্য খাতের কর্মসূচি নিয়ে কানাডার ভোটাররা ক্ষুব্ধ। এদিকে বিরোধী রক্ষণশীল দলের নেতা স্টিফেন হার্পারও স্বাস্থ্য খাতে বিপুল অর্থ ব্যয়ের ঘোষণা দিয়েছেন। পল মার্টিন কার্যত তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে এ ঘোষণা দিয়েছেন। অন্যদিকে এ খাতে কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন না এনে বিপুল অর্থব্যয়ের ঘোষণার সমালোচনা করেছেন অনেকে। টরন্টো মেডিকেল ইউনিভার্সিটির হেলথ ইকনোমিক্সের প্রফেসর পিটার কোয়েট বলেন, এ ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। কাঠামোগত পরিবর্তন না এনে বিপুল অর্থ ব্যয় পুরোপুরি অর্থহীন।

Jasim_mallik@hotmail.com

সু । ই । ডে । ন

স্টকহোম ম্যারাথনে বাংলাদেশী

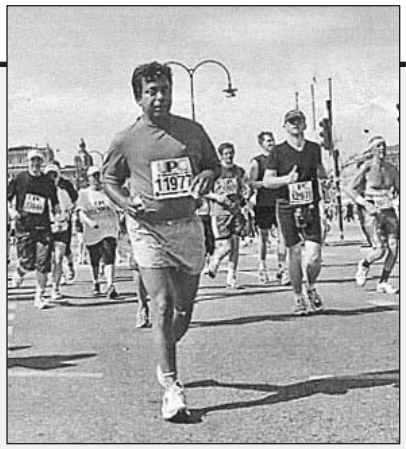

আব্দুল বাছিত চৌধুরী ম্যারাথনে রাজপথে

উত্তর মেরুর কাছাকাছি শীতপ্রধান দেশ সুইডেন। গ্রীষ্মকালে এখানে আনন্দের বন্যা বহে। শুরু হওয়া গ্রীষ্মকালীন আমেজে গত ৫ জুন অনুষ্ঠিত হয় ২৬তম স্টকহোম ম্যারাথন। স্টকহোম ম্যারাথন পৃথিবীর অন্যতম সেরা শৌখিন ম্যারাথন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা দৌড়বিদগণ এ ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রাকৃতিক নিসর্গের দৌড়পথ, প্রতিযোগিতার মান, অনুষ্ঠানের অসাধারণ আয়োজন ইত্যাদি কারণে বিশ্বের অন্যতম ক্লাসিক্যাল ম্যারাথন হিসেবে সুপরিচিত। এবারের স্টকহোম ম্যারাথন-২০০৪-এ প্রতিযোগিতায় বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দূরপাল্লার ম্যারাথন দৌড়বিদদের অংশগ্রহণ এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক অলিম্পিক ম্যারাথনে রূপ নেয়। এ প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ৫৪টি দেশের ১৬,২২১ জন ম্যারাথন দৌড়বিদ তালিকাভুক্ত হন। তন্মধ্যে ১৩,৬৬৭ জন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৮,০৩৭ জন বিদেশী প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন এবং ৩,৫৬৭ জন মহিলা প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। ১২,৮২৪ জন প্রতিযোগী সম্পূর্ণ ম্যারাথন দৌড়পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হন। ৪২ কিলোমিটারব্যাপী এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় পুরো স্টকহোম শহরটিকে দু'বার প্রদক্ষিণ করতে হয়। এবার বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন সুইডেন প্রবাসী বাংলাদেশী সাবেক ছাত্রনেতা ও বর্তমানে ক্রিমিনোলোজিস্ট (অপরাধ বিজ্ঞানী) আব্দুল বাছিত চৌধুরী। ম্যারাথন দৌড়ে তার নম্বর ছিল ১১৯৭৭। সমাপ্তি লাইনে পদক্ষেপ নেয়ার সময় তার অবস্থান ছিল ৯৯৫৩। ৬ ঘণ্টা ৬ মিনিট ২২ সেকেন্ডে তিনি সম্পূর্ণ ম্যারাথন দৌড়পথ প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করেন এবং হাজার হাজার দর্শকের বাহ্বা কুড়ান। তিনি বাংলাদেশের পক্ষে এই প্রথমবারের মতো স্টকহোম ম্যারাথনে পদক (মেডেল) লাভ করেন। প্রতিযোগিতার শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত ম্যারাথন দৌড়পথের পাশে দাঁড়ানো দর্শকবৃন্দ এবং বিভিন্ন স্থানে তৈরি মঞ্চ থেকে উপর্যুপরি বাংলাদেশের প্রতিযোগীর নাম ঘোষণা ও বাংলাদেশ, বাংলাদেশ উদ্দীপণামূলক হর্ষধ্বনি ও তুমুল করতালির মাধ্যমে তাকে উৎসাহিত করেন। ১৯১২ সালে অনুষ্ঠিত স্টকহোম অলিম্পিকের ঐতিহাসিক স্টেডিয়ামটিতে এই বাংলাদেশের প্রতিযোগীর প্রদক্ষিণ শেষে সমবেত দর্শকবৃন্দের বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হর্ষধ্বনি প্রবাসে বাংলাদেশের পক্ষে একটি ব্যতিক্রমী উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা। এই ম্যারাথন সম্পর্কিত বিস্তারিত সংবাদ সুইডেনের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র, টিভি ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার হয়। এ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে কেনিয়া, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ইটালি ও তৃতীয়স্থান অধিকার করে রাশিয়া। সুইডেনের বিচারমন্ত্রী টমাস বোডস্ট্রম স্টকহোম ম্যারাথন ২০০৪-এর গুলি ছুঁড়ে সূচনা পর্ব ঘোষণা করেন। বাংলাদেশী প্রতিযোগী আব্দুল বাছিত চৌধুরী ম্যারাথন দৌড় বিজয়ের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, এ বিজয় বাংলাদেশের বিজয়। বাংলাদেশবাসী এ বিজয়ের গৌরব বহন করবে। তিনি আশা করেন আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে এ বিজয়টি অনুপ্রেরণামূলক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

মুঃ খলিলুর রহমান রোকনী, সুইডেন

rokoni@hotmail.com

ফ্রান্স

সোনার হরিণের আশায়

অনেক আশা বুকে বেঁধে জীবন জীবিকার তাগিদে ১৯৯৭ সালের কোনো একদিন স্বদেশের মায়া-মমতা, মা-বোন আত্মীয়স্বজন সবাইকে ত্যাগ করে জীবনকে অন্য রকমভাবে সাজানোর জন্য দেশ ত্যাগ করলাম। দীর্ঘ দুই বছর থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অতিবাহিত হওয়ার পর ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে ফ্রান্সের উদ্দেশে রওয়ানা হই। অতঃপর শুরু হলো ফ্রান্সে থাকার সংগ্রাম। এখানে পার্মানেন্টভাবে থাকার জন্য রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন হয় যথাযোগ্য প্রমাণপত্র। প্রথমে OFPRA নামক অফিসে আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। জমা দেয়ার ৩-৪ মাস পর আবেদনকারীকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয়। সেখানে তাকে প্রমাণ করতে হবে কেন সে এদেশে থাকার প্রার্থনা জানাচ্ছে। উপযুক্ত কাগজপত্র এবং কথাবার্তা অবিশ্বাসযোগ্য হলে তাকে এক মাসের মধ্যে Regect করে দেয়। তবে উচ্চ আদালতে আপিল করার সুযোগ দেয়। এরপর উচ্চ আদালতে আবারও Recedence লাভ করার জন্য আপিল করার পর তাদের ইচ্ছানুযায়ী আবারও আবেদনকারীকে ডাকা হয়। তবে এখানে আইনগত দিক দিয়ে সাহায্য করার জন্য এদেশীয় উকিল, একটা নির্ধারিত টাকার মাধ্যমে আপনার পক্ষে আদালতে দাঁড়ায়। ১৯৫১ সালের জেনেভা কনভেনশনের আইনের আওতায় বিভিন্ন যুক্তি খন্ডন করে এই উকিল আপনার Recedence হওয়ার জন্য সহযোগিতা করেন। এরপর আপনার সমস্ত কিছু বিশ্বাসযোগ্য হলে এরা আপনাকে ২২ দিনের মাথায় হ্যাঁ/না একটা উত্তর দেয়। যদি আপনার আবেদন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আপনি হয়ে গেলেন এদেশের একজন। নানা রকমের সুযোগ-সুবিধা আপনি পেতে থাকবেন। যদি আপনার বক্তব্য অবিশ্বাস্য বলে সন্দেহ করেন তাহলে একই সময়ে আপনাকে দ্বিতীয়বারের মতো Regect দেবে। এভাবে চলতে থাকে আপিল রি-আপিল। এখানে আমি অনেককে দেখেছি ৭-৮ বছর থাকার পরও বৈধভাবে থাকার অনুমতি পায় না। তাদের জন্য স্বপ্নের ফ্রান্স হয়ে যায় একটা নরক যন্ত্রণা। কারণ থাকে না কোনো কাজের অনুমতি, পায় না সরকারি ভাতা। এখানে প্রথমে ১ বছর আপনাকে ভাতা দেয়া হবে, এরপর সব বন্ধ। অবৈধভাবে তেমন চাকরির সুযোগ এখানে নেই। থাকলেও নানা সমস্যায় ভুগতে হয়। অথচ আমাদের দেশ থেকে ৭-৮ লাখ টাকা খরচ করে ইউরোপে আসে। অনেকে হয়তো এসব নিয়ম কানুন সম্পর্কে অবগত নয়। অবগত হলেও দেশের বেকারত্বের অভিশাপ, রাজনৈতিক দুষ্টচক্র বিভিন্ন কিছু থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মানুষ দিনে দিনে বাড়তে থাকে। এখানে এসে বাস্তবতার সঙ্গে যখন চলতে থাকে তখনই বুঝতে পারে। এখানে আমি অনেককে দেখেছি দেশের জমি, ব্যবসা -বাণিজ্য বিক্রি করে জীবনকে নতুনভাবে সাজানোর জন্য আসে। এসে কপালে হাত দেয়। তবে যারা বৈধভাবে থাকার অনুমতি পেয়ে যায়, তাদের জন্য ঠিকই স্বর্ণের হরিণ লাভ করার কথাটা সত্যি হয়।

তাই এখানে বলা যায় ফ্রান্স কারো জন্য পৌষ মাস আবার কারো জন্য সর্বনাশ। দেশ থেকে এখনো যারা আসতে চান তাদের প্রতি অনুরোধ হলো, সব কিছু জেনে শুনে আসা ভালো। যাক আমি এখানে এসে ৩ বছরের মাথায় বৈধভাবে থাকার অনুমতি পেয়ে যাই। এ দেশের ভাষা আয়ত্ত করতে পারলে আপনার জীবনটা আরো সহজ হয়ে জীবনের গতি পরিবর্তন হয়ে যায়। সব কিছু নিয়ম কানুনের মধ্যে এসে যায়। এখানে কাজে কর্মে অফিস আদালতে কোথাও অনিয়ম চোখে পড়েনি। তাই দিন দিন এরা উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমার মতো ফ্রান্সে অনেক বাঙালি আছেন যারা বৈধভাবে বসবাস করছেন। কিন্তু বাঙালিরা এতো নিয়মের দেশে থেকেও তাদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখানে এসেও দলাদলির স্বভাব বদলায়নি। আরো আছে বিভিন্ন সংগঠন। ফ্রান্সে কম হলেও ৩০-৪০টা সংগঠন রয়েছে। নিজেদের উন্নতি নয় বরং একটা সংগঠন ভেঙে অন্য একটা সংগঠন করার ব্যস্ততায় আছেন। তবে কয়েকটা সংগঠন রয়েছে তাদের কার্যক্রম ভিন্ন, আমরা ভালো কিছু গ্রহণ করতে জানি না। এটা আমাদের চিরাচরিত অভ্যাস হয়ে গেছে।

এর মাঝেও প্রবাসে বেঁচে থাকার অন্য রকম আনন্দ পাওয়া যায়। নেই কোনো চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, অপহরণ, খুন, স্কুল থেকে সন্তান নিশ্চিতভাবে ফিরবে কি না কিংবা কলেজ থেকে আসতে তাকে কেউ অপহরণ করে কি না। অন্ততপক্ষে এসব কিছু থেকে আমরা নিরাপত্তায়ই আছি। দুঃখ হয় দেশের জন্য। শত হলেও আমার জন্মভূমি। যখন কেউ বলে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে পরপর চ্যাম্পিয়ন হয়। আর যখন শুনি একের পর এক নারীধর্ষণ। এসিড মেরে ঝলসে দেয়া, পিতার কোলে অবুঝ শিশুকে গুলি করা। যখন ইন্টারনেট খুললে পাই পূর্ণিমা, মহিমা, নাজনীন, রুমিদের আর্তচিৎকার আর যখন ফ্রান্সের খবরের কাগজে দেখি, এমপি আহসানউল্লাহ মাস্টারের লাশের খবর! দেশ কার অভিশাপের প্রায়শ্চিত্ত করে চলছে, জানিনা এর শেষ কোথায়।

Pinu Barua, C/O Shuresh Barua
19 Rue Du Fbg, Du Temple, Paris-75010

ভিয়েনা

ভেনিসে প্রবাসী সম্মেলন

'আমাদের এই শহরে কোনো বিদেশী নেই' স্লোগানে ইটালির জলকন্যা ভেনিসে অনুষ্ঠিত হয় নব্য নাগরিক সম্মেলন '০৪। মেস্ত্রের ঐতিহাসিক পার্ক বিসোলার চত্বরে সকাল ১১টা থেকে নানা ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতির কয়েক হাজার ভিনদেশীর মিলনমেলা বসে। এ সময় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, চাইনিজ, কুর্দি, সেনেগালসহ বিভিন্ন নামে ১০-১২টি স্টল দেখা যায়। মূল মঞ্চে বাজছিল জেমসের কণ্ঠে- আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি...। ভেনিসের কয়েকটি সামাজিক ও সোশ্যাল সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে বিকেল সাড়ে তিনটায় মূল সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন ভেনিসের মেয়র পাওলো কস্তা। বক্তৃতা করেন ভেনিস পৌরসভার পদস্থ কর্মকর্তা জান ফেরাংকো বোনেচ্ছ, বেপপে কাচ্ছা কাসেচ্ছরে, ক্লাউডিয়া মানতোভান, জুলিয়া তমাচ্ছিন। বিদেশীদের মধ্যে বক্তৃতা করেন রাজিয়া সুলতানা (বাংলাদেশ), মোহাম্মদ আলী (বাংলাদেশ), সরদার সালাহ উদ্দীন (বাংলাদেশ), সুমন ঠাকুর (বাংলাদেশ), কামরুজ্জামান বাবু (বাংলাদেশ), নাতাশা (মালদোভা), লতানিয়া নিমোজা (সেনেগাল), আতোরা (শ্রীলঙ্কা)। সিনোর প্রধান অতিথি তার বক্তৃতায় বলেন- রোম, বোলজানোসহ ইটালির বিভিন্ন শহরের পৌরসভায় বিদেশীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা হচ্ছে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে। কিন্তু আমরা একটা নতুন উদ্যোগ হাতে নিয়েছি। আমরা চাই ভেনিস পৌরসভায় সব দেশের প্রতিনিধি থাকবে। এই প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান নির্বাচন করা হবে, যার মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে প্রবাসীদের কাজ, বাসা, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ সব সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কথা হবে। এছাড়া গোটা ইটালির মধ্যে একমাত্র ভেনিসকে আমরা মডেল হিসেবে নিয়েছি এবং একটা এজেন্ডা তৈরি করছি যাতে ভেনিস প্রভিন্সের রেসিডেন্সধারী সব প্রবাসী ভেনিসের সব নির্বাচনে সরাসরি ভোট প্রদান করতে পারে। এ এজেন্ডা সম্পন্ন হলে তা সরকারের কাছে পেশ করা হবে এবং আগামী ২০০৫ সাল নাগাদ তা বাস্তবায়ন করা হবে।

পলাশ রহমান, ইটালি, Palashrahman@yahoo.com